ত্রিদিবের গল্প

সবচেয়ে বেশি বছর ধরে, সবচেয়ে বেশি করে ত্রিদিব এটা বুঝেছে, তার নিজের জীবনে সবচেয়ে কদর্য ব্যাপারটা আসলে সে নিজেই। কিন্তু, যখন শেষ অব্দি এটা বুঝল, তখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে, আর, নিজেকে নিজেই বদলানো মানে নিজেকে দিয়ে বদলানো, যে নিজের মধ্যেই রয়েছে গন্ডগোলটা। ওসব আসলে হয় না। কিন্তু এসব জেনে টেনে গেলে সুবিধে একটা হয়ই। নলেজ ইজ পাওয়ার। সুঠাম সঙ্গত দক্ষ সিদ্ধান্ত নেওয়া অনেক সহজ হয়। নিজেকে এমন করে জানাটা যেমন কোথাও কোথাও একটু মন-খারাপ বাড়ায়, নিজেকে সঠিক ভাবে ব্যবহার করার শক্তিটাও বাড়িয়ে দেয়। অপব্যবহার কমায়।

যেমন হল তিতলির বেলায়। তিতলি ছিল সত্যিই থিরবিজুরি। অনেক ইতিহাসের অনেক ভাঙচুর, অনেক বাঁধের বিনাশ, নগরের পত্তন আর লুপ্ত পূজাবিধি, অনেক নাম-না-জানা নদীর চরে মাছমারাদের গান ওর মধ্যে ফুটে উঠত। ও সেটা জানত না, হয়ত সেই জন্যেই উঠত।

তিতলি খুব সুন্দর সুন্দর জামা পরত, জামাগুলো প্রায় ওর মতই সুন্দর। একদিন পরেছিল অনেকটা কুঁচি-দেওয়া একটা সাদা খদ্দরের চুড়িদার, একটা ছোট ঝুলের পোড়া-লাল লং ফ্রক, ছোট গোলাপি বোতাম সামনে, অনেকটা নিচ অব্দি, গলায় স্কার্ফের মত করে নেওয়া হালকা পিংক শিফনের ওড়না। এখানে এটা লেখার কোনো প্রয়োজন ছিল না। এটা লিখল ত্রিদিব, স্মৃতির ছবিটা তার লিখে ফেলতে ইচ্ছে করল বলে। লেখা মাত্রই কাগজের পাতায় জেগে উঠল তিতলি, দু-হাত দু-পাশে ছড়িয়ে নাচের মুদ্রা করল, যেমন করেছিল দুপুরের সার্কুলার রেলের বিজন প্ল্যাটফর্মে, তখনো রিলিজ-না-হওয়া খামোশি থেকে মনীষার নাচ, আজ ম্যায় উপর আসমাঁ নিচে, ত্রিদিবকে না-দেখিয়ে পারছিল না আর। কিন্তু লেখা তো ত্রিদিবের বাপের জমিদারি নয়, লিখে ফেলেছে যখন, ত্রিদিবের জীবনের আখ্যানে এক ভাবে ঢুকিয়ে আনা যাক। এর পর থেকে, ওই পোষাকে তিতলির ছবিটা মাথায় গাঁথা হয়ে যাওয়ার পর থেকে, যখনই গলির মুখে খাদি গ্রামোদ্যোগ ভবনের দোকানটা চোখে পড়ে ত্রিদিবের, কী এক মায়া জেগে ওঠে। আধঝিমন্ত আধমর বিরক্ত মানুষগুলোকেই কেমন সুন্দর লাগে, প্রায় তিতলির মত সুন্দর।

তিতলি শুধু ত্রিদিবকে না, বদলে দিচ্ছিল সবকিছুই। দমদম স্টেশনে একটা বাড়তি ফ্লাইওভারই তৈরি হয়ে গেল। রোজ বাড়ি ফেরার পথে, যত তাড়াই থাক, কয়েক লহমার জন্যে হলেও, ঠিক একবার গিয়ে দাঁড়াত ত্রিদিব। কিছুতেই ভুল হত না। ভুল হওয়ার জো ছিল না। তিতলি তাকে বাধ্য করত। বাধ্য হতে খুব ভাল লাগত ত্রিদিবের। কয়েক মুহূর্তের জন্যে নিজেকেও আর ততটা বিশ্রী লাগত না, অনেকটা তিতলির মতই লাগত। কিছুটা সময় ত্রিদিব ভুলে থাকতে পারত যে তাকে কেন্দ্র করে মৃত্যু ঘোরে। তার সংস্পর্শে আসা মাত্র মারা যায় সেই প্রতিটি মানুষ যারা কোনোদিন জন্মেছিল, এমনকি যারা জন্মাতে পারত। মারা যায় তেমন প্রতিটি মানুষ যার পক্ষে মারা যাওয়া সম্ভব। ভুলে থাকত পারত, যে, সে ত্রিদিব এই পৃথিবীর সমস্ত মৃত্যুর কেন্দ্র। বা, আরো ঠিক করে বলতে গেলে বোধহয় বলা উচিত, তার মত অনেক কেন্দ্রই আছে, সেই অনেক কেন্দ্রের একটা সে নিজে। খুব নিশ্চিত করে জানেনা ত্রিদিব। একদিন সে

এই সমস্ত সম্ভাব্য মৃত্যুকেন্দ্রদের নিয়ে একসাথে মিলিয়ে একটা আখ্যান লিখবে – বিষমানুষ নামে।

ফ্লাইওভারের উপর গিয়ে দাঁড়ানো মাত্রই ত্রিদিব বুঝতে পারত, সে এখন গোটা ব্রহ্মাণ্ডের উৎস হয়ে গেছে সবগুলো ইলেকট্রিকের তার, দুই দিকে ফ্লাইওভারের বিস্তৃত প্রসার, নিচে, সমস্ত দিকে দিকচক্রবাল অব্দি ছড়িয়ে যাওয়া দমদম জংশন স্টেশনের রেললাইনের শিরা-উপশিরা – এই সবগুলো এসে তার শরীরেই মিশেছে, ফোটোগ্রাফের গাইডিং লাইনের মত, সে ত্রিদিবই এখন বিশ্বপৃথিবীর কেন্দ্র এবং তাবৎ মনোযোগের বিন্দু। তার থেকেই প্রবাহিত হচ্ছে আর সমস্ত কিছু। তিতলি তাকে ছোঁয়া-মাত্রই সে এমন কল্পতরু হয়ে গেছে। আজকাল যা মন চায় তাই হওয়াচ্ছে ত্রিদিব। যে কোনো ঋতুতে আকাশের যে কোনো প্রান্তে তাকানো-মাত্র ফুটিয়ে তুলছে যে কোনো নক্ষত্রমণ্ডল। ত্রিদিবের চোখ পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে ফুল ফুটে উঠছে গাছে, যাতে তার তাকাতে ভাল লাগে। যে গান যে ফিল্ম সে বারবার দেখছে, সেটাই হিট হয়ে যাচ্ছে কদিনের মধ্যে।

দমদম ফ্লাইওভারে দাঁড়িয়ে, ত্রিদিবের দশদিক চারপাশ সমস্ত কিছু তিতলি হয়ে যেত, ত্রিদিব অমনটাই চাইত। সর্বব্যাপী আচরাচর তিতলির সঙ্গে রাতের ফ্লাইওভারে দাঁড়িয়ে এই কয়েক লহমার কথা তাকে আর একবার প্রস্তুত করে দিত – দুজন উপস্থিত মানুষ এবং আরো দুজন অনুপস্থিত প্রাকমানুষ – মোট চারজনের বসবাসের বাড়িটায় যাতে সে ফিরে যেতে পারে। তিতলি ছুঁয়ে দেওয়ার পর থেকে কোনো বিভীষিকাই তাকে তেমন ছুঁতে পারে না। তিতলির স্পর্শটা তাকে কবচ-কুণ্ডলের মত ঘিরে রাখে। আবার সেই লেখকের ইচ্ছাপূরণ – তিতলির তাকে ছুঁয়ে দেওয়ার গল্পটা বরং করেই নেওয়া যাক।

খুঁড়ে একাকার করে রাখা সাদার্ন আভিনিউর ফুটপাথ দিয়ে হাঁটছিল, লেকের রেলিং ঘেঁষে রাধাচূড়ার ফুলগুলোর আদুরে হলুদ আর দেখা যাচ্ছিল না, সন্ধে ঘন হয়ে আসছে। তিতলির মাস্টার্ড রঙের জামাটাও তাই, ধূসর লাগছিল এখন। দুটো ব্যাগই ছিল ত্রিদিবের দ্রাবিড় কাঁধে, তিতলি তো আসা মাত্রই তার সবকিছু ত্রিদিবের হাতে ফেলে দিত। বলত, নাও ধরো। অমন করে দিয়ে দিতে পারতে জানতে হয়। শুধু ব্যাগ দুটো মাত্র? তিতলি, তার হেঁটে চলার ক্লান্তি, যত কষ্ট পেয়েছে নানা দিক থেকে – এই সমস্ত ভার তাকে বকলমা করে দিতে পারে না?

হাঁটছিল ওরা। আসলে তিতলি হাঁটছিল, আর ত্রিদিব তাকে দেখছিল – কেন মাত্র দুটো চোখ হয় মানুষের? তিতলির প্রতি পদপাতে টলটলে কোমল হচ্ছিল ধরণী, আর বহু বহু যোজন নিচে মাটি হয়ে যাওয়া মানুষের লুপ্ত হৃদপিণ্ডের ধুকধুক শুনতে পাচ্ছিল ত্রিদিব। তিতলি ওসব খেয়ালও করছিল না। একটানা হেঁটে চলার ক্লান্তি মুখ থেকে মুছবে বলে, কোমরের কাছ থেকে কুচি ঝালর লাগানো লাল-সাদা বাটিকের নরম তুলতুলে ওড়না তুলে এনেছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে সাদার্ন আভিনিউর সব আলো জ্বলে উঠল, চিবুকের সোহাগী চিকণ মুক্তোবিন্দুদের সন্ধের আকাশ শেষবার দেখবে বলে। আতঙ্কে শিউরে উঠে অস্ফূট আওয়াজ করেছিল তিতলি, চোখ বন্ধ হয়ে গেছিল তার, হাত মুঠো – লিখতে লিখতে ত্রিদিব

দেখতে পায় গৌরী নরম করতলে জোরে চেপে ধরা নিজের আঙুলের দাগ। কিবোর্ড করতে করতেই ত্রিদিব ওই দুই হাত তুলে আনে নিজের মুখে, চোখের পাতা বুলিয়ে দেয়। তিতলি বলেছিল, কী লম্বা তোমার চোখের ল্যাশগুলো – আরাম পায় ত্রিদিব, কোনো একটা কাজে তো লাগলো শেষ অব্দি তার লম্বা আইল্যাশ।

রাস্তা জুড়ে কিলবিল করছিল দু-তিনটি দেহ। কার দেহ – মানুষের? একটা দেহ দৈর্ঘে অত ছোট কেন? ঠিক কী দেখেছিল, আজো ভাল মনে আনতে পারে না ত্রিদিব। তিতলি ততক্ষণে পিছন ফিরে তাকে আঁকড়ে ধরেছিল প্রাণপণে, হাঁফাচ্ছিল, ঠিক করে শ্বাস নিতেও পারছিল না আর। নিজের শরীরের কাছে এতটা কৃতজ্ঞ আগে কোনোদিন লাগেনি ত্রিদিবের। এই হাত এই পা, এই নরদেহ, স্বর্গ মর্ত পাতালের সব যাদু সব প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছিল এই নরদেহে – তিতলিকে আশ্রয় দিয়েছিল। এর পর থেকে কত লক্ষ বছর সমস্ত আলো হাওয়া জল রোদ্দুরের হাত থেকে নিজের শরীর বাঁচিয়ে ফিরতে চাইবে ত্রিদিব – নিজের শরীর মানে তিতলির ছোঁয়া।

সেই শুরু – আর কোনো বিভীষিকা কখনো ছুঁতে পারেনি ত্রিদিবকে। সে কি নিজেকেও আর ছুঁয়ে উঠতে পারে? তিতলির একটা উপনিবেশ হয়ে গেছে সে, না, তার চেয়েও বেশি, তিতলির একটা সংযোজন। তার এই তিতলি হয়ে যাওয়া, এবং, রাস্তার ফুটপাথে কিলবিলে ওই শরীর, একটা বড় একটা ছোট, বা হয়ত একটা শরীরেরই নানা অংশ – এই দুটোকে নিয়েই শেষ হবে এই আখ্যানটা, যার গোটাটা ত্রিদিব নিজেই খুব নিশ্চিত ভাবে কোনোদিন বুঝে উঠবে না। চেষ্টা করবে বুঝতে, খুবই চেষ্টা করে চলবে, নিজেকে ভেঙেচুরেও দেখবে। আখ্যান শেষ হবে এই নিয়েই। কিন্তু এখনো একটু দেরি আছে, তার আগে বর্তমান, এই বর্তমান। আবার, এই বর্তমানে তিতলি তো নেইও, তাই, ত্রিদিবের মধ্যে কমে আসে ম্যাজিক, কমে আসে গতি, ত্রিদিবের বর্তমানে, তার লেখায়, তার আখ্যানে, এই আখ্যানে।

কিন্তু, তিতলির একদা-উপস্থিতির যাদু ত্রিদিবকে শান্ত রিলাক্সড নির্ভীক করে দিয়ে গেছিল। কদিন আগেও বাড়ির গলির মুখে পৌঁছনোর একটু আগে থেকে বারবার ঘুরপাক খেতে হত ত্রিদিবকে, গলিটা হারিয়ে ফেলতে হত, খুঁজে চলতে হত, সিগারেট খেতে হত একাধিক – এখনো কি মিউনিসিপালিটির লোকজন আছে বাড়িতে, নাকি চলে গেছে? হিশেবটা কখনোই মিলত না। ঢুকে দেখত, ঘর জুড়ে তারা বিরাজ করছে। আবার এক এক দিন, কোনো হিশেব ছাড়াই, ঘরে ফিরে দেখত, কেউ নেই কোথাও, সবাই কোথাও গেছে, মিটিং আছে। ঘর তো আসলে ওই একটাই। এর বাইরে, পিছনের ওই একফালি জায়গা, তার মধ্যে কোনোক্রমে গুঁজে দেওয়া তক্তাপোষ আর লেখার টেবিল। তার পরেও বই, মেঝে থেকে প্রতিটি ইঞ্চি জায়গা জুড়ে শুধু বই আর বই, পা-টাও সোজা করে খোলা যায় না। সে না-যাক, ক্ষতি নেই, পায়েরা আর প্রতিবাদ করে কবে? আর তদ্দিনে ত্রিদিব নিজের সঙ্গে বসবাসের ব্যাকরণ বুঝতে শুরু করেছে, যে জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের, তার সাথে তার আর হবে নাকো দেখা, এই জেনে। লেখা শুধু

লেখা দিয়েই নিজেকে ভাবতে জানতে চিনতে চেনাতে শুরু করেছে। শুরু করেছে লেখা ছাড়া আর সবকিছু সমস্ত কিছু একটু একটু করে ছেঁটে ফেলা। ছাঁটতে ছাঁটতে সত্যিই এক সময় জীবনের আর কিছুই রইল না, ত্রিদিব এখন কোনো স্মৃতি মনে না-এলে, লেখার ফাইল খোলে, কোনো না কোনো লেখায় নিশ্চয়ই আছে।

লেখা ছাড়া ত্রিদিব আর কিছু পড়ে নেই বলে তার সুবিধেই হয়েছে। কিছুতেই কিছু এসে যায় না আর। এই একচিলতে তার ব্যক্তিগত বরাদ্দের ভূমি থেকে মাত্র ফুট সাতেক দূরেই প্রবল চিল্লামিল্লি হয়, মিউনিসিপ্যালিটি নিয়ে, তার ইলেকশন নিয়ে। কেয়ার কোনো ক্যাডার কোনো আকস্মিক অসংযমী আবেগে চেঁচিয়ে ওঠে, একটা বুথ থেকে তুলে পিছন ফাটিয়ে দেব – সব কটায় খবর হয়ে যাবে – আর কিছু করতে হবে না। এই এলাকার থেকে জেলার নেতা পরিতোষদা তিরস্কার করে গম্ভীর গলায়, এই – কেয়া আছে এখানে। কেয়া, তার সমস্ত পরিশীলন বজায় রেখেই, আবার একটু বকে দেওয়াও থাকে তাতে, বলে, না-না ঠিক আছে। তারপর বলে, পরিতোষদা, স্লাম-উইমেনস নাইটস্কুলের গ্রান্টটা কিন্তু এখনো হয়নি, এর পরে হলে কিন্তু ওরা বলবে, ইলেকশানের আগের প্রচার হচ্ছে, দেখুন আমি বলিনা, মেয়েদের সবাইই ভুলে যায়, আপনিও।

এখানে বসে বসে শব্দের মানচিত্র থেকেই বুঝতে পারে ত্রিদিব, কেয়া একটু ঝুঁকে গেছে পরিতোষদার দিকে, একটু বাড়তি সমাদর, একদম শেষে একটু নারী-অভিমানও। সবই কানে আসতে থাকে ত্রিদিবের, আর লেখার ডিটেইলস বাড়ে। তারটা এবং কেয়ারটা, দুটো বাচ্চার বেলাতেও তাই, অবশ্য ওদের বাচ্চা যদি বলা যায় আদৌ। বড়টা ওর কানের পাশের ফাটল দিয়ে আজ কোনো অন্য আওয়াজ বার করল, বা, ছোটটা টেবিলের কিনার বেয়ে অ্যাশট্রে বেয়ে ঘষটাতে ঘষটাতে এগোনোর সময় আজ একটু অন্য কোনো রঙের রক্ত বেরোল – এগুলোও ডিটেইলস, কোনো লেখায় কাজে লেগে যাবে, অবশ্য তার আগে চেক করে নিতে হবে, ওটা কি রক্ত আদৌ, নাকি লালা, বিবর্তনের এই স্তরে হয়ত গোটা শরীর দিয়েই লালা বেরোত।

এখানে এরকম বসে থাকে ত্রিদিব আর ডিটেইলস বাড়িয়ে চলে। অবশ্য কেয়া, তার অন্য অনেক কিছুর মত, এই রাজনৈতিক লোকদের সামনে ওই বাচ্চাদুটোকে নিয়েও ভারি সঙ্কোচে থাকে। যদিও, ত্রিদিবের ধারণা, সবকিছুই জানা এদের। তাই হয়, কোনো কিছুই অজানা থাকে না এদের, অজানা রাখতে এরা জানেই না মোটে। তাও, কেয়া কখনো অ্যালাও করে না, দরজা খোলা-রেখে বাচ্চাদুটোর কৌটো খোলা, বা, সেখান থেকে ওদের বার করা। সেটা বরং ভালই লাগে ত্রিদিবের। অবশ্য সবকিছুই আজকাল ভাল লাগে তার, হয় ভাল লাগে নয় ডিটেইলস হিশেবে ভাল লাগে।

এটা ভাল লাগে কারণ এই যে, দরজাটা বন্ধ করে দেওয়া যায়, নিজের খুশি মত। বাচ্চাদুটোর কোনো একটা যুক্তি নামিয়ে দিলেই হয়, সত্যি-মিথ্যে জানানোর পক্ষে এরা বড্ড বেশি ছোট, এবং এর থেকে

আর বড়ও হবে না কোনোদিন। তারপর, কৌটো খুলে, বাচ্চাদুটোকে বার করে নিয়ে, ব্যাঘাতহীন ছন্দপতনহীন এদের পর্যবেক্ষণ করে চলে। হয়তো আরো এরা এত অপ্রাকৃতিক ভাবে ছোট বলেই, ছোটটাকে তো কৌটো থেকে বার করতে হয় প্লাস্টিকের চিমটে দিয়ে, কী একটা স্নেহ-বিহ্বলতা কাজ করে ত্রিদিবের মধ্যে। এটা তার, ওটা কেয়ার, এরকম কোনো ভাগাভাগির নীচতাও নেই ত্রিদিবের মধ্যে। একটু বড় সাইজের বাচ্চাটা ত্রিদিবের, ওটাই প্রথম হয়েছিল। ওর বয়েস সতেরো সপ্তাহ, এবং চিরকাল ওটা একই থাকবে, কোনো দিন আর সতেরো থেকে আঠেরো হবেনা।

মাঝেসাঝে কেউ বাচ্চার কথা জিগেশ করলে বলতে হয়, বাচ্চা-কাচ্চা নেই তাদের। কেয়া যদি বলাটা অ্যালাও করত, বেশ একটা মজা করা যেত। বাচ্চা থাকলে এর পরের প্রশ্নই হল, বয়েস কত? কী চমকাত লোকগুলো, যদি বলা যেত, বড়টার বয়েস তেইশ সপ্তাহ বিবি, বিফোর-বার্থ, এটা বদলাবে না, কারণ, ও আর কোনোদিন জন্মাবে না। কেয়ার বাচ্চাটা আরো ছোট, নয় সপ্তাহ বা একত্রিশ সপ্তাহ বিবি। প্রথমটার বেলায় অনেক চিন্তা প্রতিচিন্তা অস্বস্তি হয়েছিল তাদের, সিদ্ধান্তটা নেওয়ার আগে। দ্বিতীয় বার বরং অনেক আগে থেকে ঠিক সময়ে তারা নিতে পেরেছিল ডিসিশনটা। দুবার দুটো এমটিপি হয়েছে দুজনের ডিসিশনে। যে এমটিপি যার ডিসিশনে, যে বাচ্চাকে যে মেরেছে, সেই বাচ্চা তার, ল্যান্ড টু দি টিলার, ইল্ড টু দি কিলার – জীবনে, আখ্যানে, ত্রিদিবের বিকটতায়। আখ্যান আর জীবন – দুটোকেই সে বয়ে নিয়ে চলে তার আখ্যানে।

শুধু তিতলিকে আর আলাদা করে বইতে হয়না, তিতলিত্ব এখন তার ভিতরেই বন্দী, তা আর বদলাবেও না। যখনই কোনো মেঘলা সূর্যাস্তের আকাশে বদলাতে থাকা ছবির রং আর গতি তাকে উদ্ভাসিত করে, নিজের মধ্যে আর একবার সে তিতলিকে খুঁজে পায়। স্মৃতির মধ্যে ডুবে যেতে যেতে নিজেকে কি অপ্রতিরোধ্য অবিকল্প রকমের ভাগ্যবান লাগে তার। এই গ্রহের প্রথমতম সূর্যাস্তের বিকেলে চেতলা থেকে নিউ-আলিপুর যেতে পরিত্যক্ত একটা কাঠের সাঁকোয় তাকে নিয়ে গেছিল তিতলি। আসলে নিয়ে যায়নি, নিজে নিজে গেছিল, আর ওর মানিব্যাগ, ব্যাগ, এবং ওকে পাহারা দেওয়ার দায় বহন করে ওর পিছন পিছন গেছিল ত্রিদিব। ম্যাজিক তিতলি এক আকাশ ম্যাজিক উপুড় করে দিয়েছিল ত্রিদিবের সামনে। সূর্যাস্তের কনে-দেখা-আলোয়, ভাঙা ব্রিজের মাথায় বসে, ত্রিদিবকে সূর্যাস্ত দেখতে শিখিয়েছিল তিতলি। শুধু সূর্যাস্ত কেন, কোনো কিছু, যে কোনো কিছুই, যা দেখতে নিজের বাইরে গিয়ে এক কদম-ও দাঁড়াতে পারে ত্রিদিব, সেখানেই আর একবার, আরো একবার তিতলিকে খুঁজে পায়।

তিতলিকে আর আলাদা করে মনে করতে হয় না তার, কিন্তু ওই দৃশ্যটা বারবার তার মাথায় ফিরে ফিরে আসে। কী দেখে অমন ভয় পেয়েছিল তিতলি? কী? তার নিজের সামনে প্রাকজন্ম প্রাকমানুষ এই ভ্রূণদুটো, এরা কি আসলে একটা দেজা-ভু? একটা ফিরে দেখা? এরকম তো বারবারই হয়েছে তার। তার চোখের সামনে আগের থেকেই ঘটে গিয়েছিল যা পরে ঘটতে যাচ্ছে? অথবা, গোপন ভাষায় লেখা একটা অদৃশ্য সঙ্কেত? ছবিটা আসলে তাকে নয়, তিতলিকেই দেখানো হয়েছিল? তিতলিকে আগাম জানিয়ে

দেওয়া হয়েছিল তার ভবিষ্যত? তিতলি সেটা দেখেনি, সাবধান হয়নি, ত্রিদিব এক ঝলক দেখেছিল। সেই দেখাটাই এখন নানা আকারে নানা চেহারায় ঘটে চলে তার বাস্তবতা জুড়ে, তার দেখা এবং না-দেখা বাস্তবতা।

রেখে আসার পর আর কখনো দেখতে যায়নি ত্রিদিব। তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সে জানে তিতলি তার ম্যাজিক, যে ম্যাজিক সে ত্রিদিব নিজে হতে চেয়েছিল কিন্তু পারেনি। নিজের লেখা পড়ে, এই লেখাটা পড়েও, শিউরে ওঠে ত্রিদিব, ঠিক তার, ত্রিদিবের, নিজস্ব কদর্যতা দিয়েই এদের বোঝা যায়, ওই কদর্যতা নিয়েই এদের লেখা যায় কেবল। এমনটা কখনো হতে চায়নি সে, কেউই চায়না। সবাই চায় তিতলি হতে। পারে না, পেরে ওঠে না। ত্রিদিব জানে, স্পর্শ মাত্র, দৃষ্টিপাত মাত্র, এমনকি আখ্যানে তার উল্লেখ মাত্র, তিতলি তাকে বদলাতে থাকে, বারবার বারবার বারবার। তাই সেই রিস্কই নেয়না ত্রিদিব আর, ফিরে গিয়ে একবার যে দেখবে, যেখানে তিতলিকে সে রেখে এসেছে। হয়তো সেখানেও বদলাচ্ছে তিতলি, কসবার পরিত্যক্ত কারখানার মাটির গভীরে শাখাপ্রশাখাময় ওই গোপন পয়ঃপ্রনালীতে, বদলাচ্ছে বদলাচ্ছে, তার সন্তানও হচ্ছে, সে তো ম্যাজিক। আবার পয়ঃপ্রনালীর বাস্তবতা তো বাস্তবতাও। তিতলির আর তিতলির সন্তানদের ওই অবয়ব, আগাম যা ফুটে উঠেছিল সন্ধের সাদার্ন আভেনুতে।

ত্রিদিব তার নতুন লেখার কথা ভাবে এখন, ওই বাচ্চাদুটোকে নিয়ে। কত কিছু সে দেখছে শিখছে জানছে এদের দেখে প্রতি মুহূর্তে। কত বিজ্ঞান কত তত্ত্ব। বড়টা আছে মাছ থেকে উভচর হওয়ার স্তরে, আর ছোটটা আছে অমেরুদণ্ডী থেকে সরীসৃপে পরিবর্তনের পর্যায়ে। কিন্তু এটা এই লেখা নয়, পরের কোনো লেখা, সেটাও ঠিক ত্রিদিবেরই মত বিকট হবে, এবং তিতলিও আর থাকবে না তাতে, আখ্যানের আর্কাইভে তিতলির একটা আখ্যানই যথেষ্ট।